

BADOL BORISONE

KAZI NAZRUL ISLAM

All kinds of pdf download:

[MyMahbub.Com](http://MyMahbub.Com)



নজরুল  
গল্প সমগ্র

থেকে

বাদল বরিষনে



এক নিমেষের চেনা

বৃষ্টির বাম্-বামানি শুনতে শুনতে সহসা আমার মনে হ'ল, আমার বেদনা এই বর্ষার সুরে বাঁধা। . . . . .

সামনে আমার গভীর বন। সেই বনে ময়ূরে পেখম ধ'রেছে, মাথার ওপর বালাকা উড়ে যাচ্ছে, ফোঁটা কদম ফুলে কার শিহরণ কাঁটা দিয়ে উঠছে, আর কিসের ঘন মাতাল-করা সুরভিতে নেশা হ'য়ে সারা বনের গা ট'লছে! . . . .

এটা শ্রাবণ মাস, না? — আহা, তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে! —

সে হ'ল আজ তিন বছরের কথা। আমার এই খাপ-ছাড়া জীবনে তার স্মৃতিগুলো ঝড়ের মুখে পদ্মবনের মত ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেছে। কখনও তার একটি কথা মনে পড়ে, কখনও আধখানি ছোঁওয়া আমার দাগা-পাওয়া বুকে জাগে। মানস-বনের যুঁই-কুঁড়ি আমার ফুটতে গিয়ে ফুটতে পায় না, শিউলির বোঁটা শিথিল হ'য়ে যায়। ওরই সাথে এই শাঙন-ঘন দেয়া-গরজনে আর এক দিনের অমনি মেঘের ডাক মনে পড়ে, আর আঁখি আমার আপনি জলে ভ'রে ওঠে।

সে-দিন ছিল আজকার মতই শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী। পথহারা আমি ঘুরতে ঘুরতে যে-দিন প্রথম এই কালিঙ্গরে এসে পড়ি, সে—দিন এখানে কাজরী উৎসবের মহা ধূম প'ড়ে গেছে। আকাশভরা হালকা জলো মেঘ আমারই মত খাপছাড়া হ'য়ে যেন অকূল আকাশে কূল হারিয়ে ফিরছিল। তারই ঈষৎ ফাঁকে সুনীল গগনের এক ফালি নীলিমা যেন কোন্ অনন্ত-কান্নারত প্রেয়সীর কাজলমাখা কালো চোখের রেখার মত করুণ হ'য়ে জাগছিল! পথ চলার নিবিড় শ্রান্তি নিয়ে কালিঙ্গরের উপকণ্ঠের বাঁকে উপবনের পাশে তার সাথে আমার প্রথম দেখা। এই হঠাৎ-দেখাতেই কেন আমার মনে হ'ল, এ-মুখ যে আমার কত কালের চেনা—কোথায় যেন একে হারিয়েছিলাম। সেও আমার পানে চেয়ে আমার চাওয়ায় কি দেখতে পেলে সেই জানে,—তাই পথ চ'লতে চ'লতে তার হাতের কচি ধানের ছোট্ট গোছাটি মুখের ওপর আধ-আড়াল ক'রে আমায় জিজ্ঞেস ক'রলে,—“পরদেশীয়া রে, তুহার দেশ কাঁহা?”

সে স্বর আমার বাইরে ভিতরে এক ব্যাকুল রোমাঞ্চ দিয়ে গেল, বুকের সমস্ত রক্ত আকুল আবেগে কেঁপে কেঁপে নৃত্য ক'রে উঠল।

এ কোন্ চির-পরিচিত স্বর। এ কে ছলনা ক'রে আমায়? পুবের হাওয়া

আমার পাশ দিয়ে কেঁদে গেল—“হায় গৃহহীন, হায় পথহারা!” ঝড়ে-ওড়া এক দল পলকা মেঘের মত মল্লারের সুরে পথের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে কাজরী গায়িকা রূপসীরা গেয়ে যাচ্ছিল,— যুড়্ঘট-পট খোলো আরে সাঁবলিয়া।—ওগো শ্যামল, এখন তোমার ঘোমটা খুলে ফেল!

আমার কাছে তাকে এমন ক’রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তরুণীরা আঁখির পলকে থামকে দাঁড়াল, তারপর চুল ছড়িয়ে বাহু দুলিয়ে আঁচল উড়িয়ে ব’লে উঠল,—“কাজরীয়া গে! ক্যা তোরি সাঁবলিয়া আ গয়ি?”

সে তাদের এক পাশে সরে গিয়ে কাঁপা গলায় ব’ললে,—“নহি রে সজ্জিয়া নহি! যো পরদেশী জোয়ান্...”

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন ব’লে উঠল,—“ক্যা তেরি দিল ছিন্ লিয়া?”

সে লজ্জায় আর দাঁড়াতে পারল না, খাম্বা আমার দিকে অনুযোগ-তিরস্কার-ভরা বাঁকা চাউনি হেনে চ’লে গেল!

পথের ঐ বাঁক থেকেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তাদের ধানী রঙ এর শাড়ির ঢেউ আর আসমানী রঙ-এর ওড়নার আকুল প্রান্ত। র’য়ে র’য়ে তাদের এলানো কেশপাশ বেয়ে কেমন মধুর এক সোঁদা—গন্ধ ভেসে আসছিল! অতগুলি সুন্দর মুখের মাঝ থেকে আমার মনে জগ্-জগ্ ক’রছিল শুধু ঐ কাজরীয়ার ছোট্ট কালো মুখ,— যা শিল্পীর হাতের কালো পাঁথর-কোঁদা দেবী মুখের মত নিটোল! বিজলী—চমকের মত তার ঐ যে একটি দুরন্ত চপল গতি, তারই মধুরতাটুকু আমার মনের মেঘে বারে-বারে তড়িৎ হেনে যাচ্ছিল।

পথের পাশের দোলনা বাঁধা দেবদারু-ভলায় দাঁড়িয়ে আমার শুধু এই কথাটিই মনে হ’তে লাগল, এই এক পলকের আধখানি চাওয়ায় কেমন ক’রে মানুষ এত চির-পরিচিত হ’য়ে যেতে পারে।

অভিমানের দেখা-শোনা

তার পরের দিন আমলকী বনে দাঁড়িয়ে সেই আগেকার দিনের কথাটাই ভাবছিলাম,—আচ্ছা, এই যে আমার মানসী বঁধু—একে কবে কোন্ পূর্ববীর কান্না-ভরা খেয়ার-পারে হারিয়ে এসেছিলাম? সকল স্মৃতি ওলট-পালট ক’রেও তার দিন ক্ষণ মনে আসি-আসি ক’রেও যে আসে না, অথচ মনের-মানুষ-আমার একে দেখেই কেমন ক’রে চিনে ফেললে। তাই সে আমার আঁখির দীপ্তিতে ফুটে উঠে ব’লে উঠল,—এইতো আমার চির জনমের চাওয়া তুমি! ওগো,—এই তো আমার চির-সাধনার ধন তুমি!..

আর একবার আমার স্মৃতির অতল তলে ডুব দিলাম, এমন সময় ঝড়ের সুরে কাজরী গান গাইতে গাইতে রূপসী নাগরীরা আমার পাশ বেয়ে উধাও হ’য়ে গেল,—

“চড়ে ঘটা ঘন ঘোর গরজ রহে বদরা রে হোরি।

রিম-ঝিম রিম-ঝিম পানি বরষে রহি রহি জিয়া ঘাবরাবৈ রামা

বহৈ নয়নাসে নীর ময়েল ভয়ি কজুরা রে হোরি।”

[ঘোর ঘটা ক’রে গগনে মেঘ ক’রেছে, বাদল গরজন ক’রেছে, রিম-ঝিম-রিম-ঝিম বৃষ্টি ঝরছে, থেকে থেকে জান আমার ঘাবরিয়ে উঠছে, নয়ন বেয়ে আঁসু ঝ’রছে-ওগো, চোখের কাজল আমার মলিন হ’য়ে গেল!]

বর্ষার মেঘ চলে গেল। মর্মে আমার তারই গাঢ় গমক গুম্বে ফিরতে লাগল,-‘ময়েল ভয়ি কজুরা রে হোরি!’- ওগো প্রিয়, চোখের কাজল আমার মলিন হ’য়ে গেল! সে কোন্ অচেনার উদ্দেশ্যে এ অবুঝ-কান্না তোমার ওগো বিদেশিনী? সে কথা সেও জানে না, তার মনও জানে না..

আবার সেই সন্তাপহারী আমার চিরবাস্তিত মেঘ গুরু-গরজনে ডেকে উঠল! বনের সিক্ত আকাশকে ব্যথিয়ে ময়ূরের কেকা-ধ্বনির সাথে চাতকের অতৃপ্তির কাঁদন রণিয়ে রণিয়ে উঠছিল,—“দে জল, দে জল!” হায় রে চিরদিনের শাস্তত পিয়াসী! তোর এ অনন্ত পিয়াসা কি সারা সাগরের জলেও মিটল না?

আমার কেমন আবেছা এক কণা স্মৃতি মনের কানে ব’লছিল,— তুমি আগে এমনই চাতক ছিলে, তোমার পিপাসা মিটবার নয়!

ভেজা মাটির আর, খস-খস-এর গুমোট-ভরা ভারী গন্ধে যেন দম আটকে যাচ্ছিল; ও-ধারে ফোটা কেয়া ফুলের আধফোটা যুথির বেলীর কুঁড়ির ঝরা শেফালী-বকুলের দিল্ মাতানো খোশবুর মাঝে মাঝে পদ্ম আর কদম্বের স্নিগ্ধ সুরভি মধুর আমেজ দিচ্ছিল! বর্ষার ব্যথা আমার দিকে গভীর মৌন চাওয়া চেয়ে শুধাচ্ছিল,—

“এমন দিনে তারে বলা যায়,  
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।”

হায়, কি বলা যায়? কাকে বলা যায়? এ উতল-পাগল তার কিছুই জানে না, অথচ সে কি যেন ব’লতে চায়-কাকে যেন বুকের কাছে পেতে চায়। এই মেঘদূত তার কাছে তার পালিয়ে-যাওয়া প্রিয়তমার সন্ধান ক’রে গেছে, তাই সেই চাওয়া-পাওয়া-টুকুর বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছে, তাই সে মেঘদূতকে অভিনন্দন জানাচ্ছে,—

“এস হে সজল ঘন বাদল-বরিষণে।”

আজ আর একবার মনে হল সে তার বিদায়ের দিনে বলেছিল,—“আবার দেখা হবে, তখন হয়তো তুমি চিনতে পারবে না।”

আজ সেই বিদায়-বাণী মনে পড়ে আমার বক্ষ কান্নায় ভ’রে উঠেছে। আমার পাশ দিয়ে কালো কাজরিয়া যখন তার চাউনি হেনে চ’লে গেল, তখন ঐ কথাটিই বারে বারে মনে প’ড়ছিল,—হয়তো তুমি চিনতে পারবে না!



তাই কাজরিয়াকে ডেকে ব'ললাম,— এই তো তোমায় চিনতে পেরেছি তোমার এই চোখের চাওয়ায়!

কাজরিয়া চুল দিয়ে মুখ ঝোঁপে চ'লে গেল! তার ঐ না-চাওয়াই ব'লে গেল সেও আমায় চিনতে পেরেছে।...

আবার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। ঝঞ্ঝার উত্তরালের মত দোল খেয়ে খেয়ে পাশের উপবন হ'তে তরুণী কণ্ঠের মল্লার হিন্দোলা ভেসে আসছিল- মেঘবা ঘুম ঘুম বরষাবৈ ছাবৈ বদরিয়া শাঙন মে!

পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আকাশ বেয়ে হাজার পাগলা-ঝোরা ঝ'রছে-ঝম্ ঝম্ ঝম্! যেন আকাশের আঙিনায় হাজার হাজার দুট্ট মেয়ে কাঁকরভরা মল বাজিয়ে ছুটোছুটি ক'রছে! তপোবনে গিয়ে দেখলাম, সেই বৃষ্টিধারায় ভিজ়ে ভিজ়ে মহা উৎসাহে বিদেশিনী তরুণীরা দেবদারু ও বকুল শাখায় ঝুলানো দোলনায় দোল খেয়ে খেয়ে কাজরী গাইছে। ঝড়-বৃষ্টির সাথে সে কি মাতামাতি তাদের! আজ তাদের কোথাও বন্ধন নেই, ওদের প্রত্যেকেই যেন এক একটা পাগলামি প্রকৃতি! কি সুন্দর সেই প্রকৃতির উদ্দাম চঞ্চলতার সনে মানব-মনের আদিম চির-যৌবনের বন্ধ-হারা গতি-রাগের মিলন!-শাঙন মেঘের জমাট সুরে আমার মনের বীণায় মূর্ছনা লাগল! আমার যৌবন-জোয়ারও অমনি ঢেউ খেলে উঠল। মনের পাগল অমনি ক'রে দোদুল দোলায় দুলে সুন্দরীদের এলো চুলের মতই হাওয়ার বেগে মেঘের দিকে ছুটল,— হায়, কোথায়, কোন্ সুদূরে তার সীমা রেখা!

হিন্দোলার কিশোরীরা গাচ্ছিল কাজল-মেঘের আর নীল আকাশের গান! নীচে শ্যামল দুর্বায় দাঁড়িয়ে বিনুনী-বেণী-দোলানো সুন্দরীরা মৃদঙ্গে তাল দিয়ে গাচ্ছিল কচি ঘাসের আর সবুজ ধানের গান! তাদের প্রাণে মেঘের কথা ছোঁওয়া লেগেছিল।..... মেঘের এই মহোৎসব দেখে আপনি আমার চোখে জল ঘনিয়ে এল। দেখলাম সেই কালো কাজরিয়া-দোলনা ছেড়ে আমার পানে সজ্জল চোখের চেনা চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে! আমার চোখে চোখ প'ড়তেই সে এক নিমিষে দোলনায় উঠে ক'য়ে উঠলো, “সজ্জনিয়া গে, ওগি সুন্দর পরদেশীয়া!” তার সহ মতিয়া দুলতে দুলতে বাদল-ধারায় এক রাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে ব'লল, —“হা রে কাজরিয়া তুহার সাবলিয়া!”

কাজরিয়া মতিয়ার চুল ধ'রে টেনে ফেলে দিয়ে পাশের বকুল গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি ভাবছিলাম, এমনি ক'রেই বুঝি মেঘে আর মানুষে কথা কওয়া যায়! এমনি করেই বুঝি ও-পারের বিরহী যক্ষ মেঘকে দূতী ক'রে তার বিচ্ছেদ বিধুরা প্রিয়তমাকে বুকের ব্যথা জানাত! আমার ভেজা-মন তাই কালো মেঘকে বন্ধু ব'লে নিবিড় আলিঙ্গন ক'রলে!

চ'মকে চেয়ে দেখলুম, সে কখন এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে! তার গভীর অপলক দৃষ্টি মেঘ পারিয়ে কোন্ অনন্তের দিগ্বলয়ে পৌছেছিল, সে-ই জানে। তার পাশে থেকে আমারও মনে হ'ল ঐ দূর মেঘের কোলে দাঁড়িয়েছি শুধু সে আর



আমি। কেউ কোথাও নেই, উপরে-নীচে আশে পাশে শুধু মেঘ আর মেঘ, — সেই অনন্ত মেঘের মাঝে সে মেঘের বরণ বাহু দিয়ে আমার জড়িয়ে ধরে তার মেঘলা দৃষ্টিখানি আমার মুখের উপর তুলে ধরেছে! ঐখানেই ঐ চেনা-শোনা জায়গাটিতেই যেন আমাদের প্রথম দেখা শুনা, ঐখানেই আবার আমাদের অভিমানের ছাড়াছাড়ি, এই কথাটা আমাদের দুই জনেরই মনের অচিন কোণে ফুটে উঠতেই আমরা একান্ত আপনার হ'য়ে গেলাম। যে কথাটি হয়তো সারা জীবন চোখের জলে ভেসেও ব'লা হত না, এই ঝড়-বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক নিমিষে চারিটি চোখের অনিমিষ চাউনিতে তা কওয়া হ'য়ে গেল!...

আমি ব'ললাম-কাজরি আমি অনেক জীবনের খোঁজার পর তোমায় পেয়েছি! এই মেঘের ঝরায় যে প্রাণের কথা প্রাণ দিয়ে সে শুনছিল, সহসা তাতে বাধা পেয়ে সে সচেতন হ'য়ে উঠল। চখা হরিণীর মত ভীত-ব্রহ্ম চাউনি দিয়ে সে চারিদিকে চেয়ে আচমকা আর্ত আকুল স্বরে কেঁদে উঠল। আর দাঁড়াল না, হুঁকরে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলে! যেতে যেতে ব'লে গেল, — নহি রে সুন্দর পরদেশী, মর্য্য কারী কাজরিয়া হুঁ; — ওগো সুন্দর বিদেশী, আমি কালো! আরও কি ব'লতে ব'লতে অভিমানে ক্ষোভে তার মুখে আর কথা ফুটল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল।'

একটি পুরো বছর আর তার দেখা পাই নি!...

আজ শাঙন রাতের মাতামাতিতে হৃদয় আমার কথায় আর ব্যথায় ভরে উঠেছে, আর তার সেই বিদায়-দিনের আরও অনেক কিছু মনে প'ড়ছে। আজ আমার শিয়রের ক্ষীণ দীপ শিখাটিতে বাদল-বায়ের রেশ লেগে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে, আমার বিজন কক্ষটিতে সেই কাঁপুনি আমার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে—হায়, আজ তেমন ক'রে আঘাত দেবারও আমার কেউ নেই! প্রিয়তমের কাছ থেকে আঘাত পাওয়াতে যে কত নিবিড় মাধুরী, তা বেদনাতুর ছাড়া কে বুঝবে? যার নিজের বুকে বেদনা বাজে নি, সে পরের বেদনা বুঝবে না, বুঝবে না!

সে ব'লেছিল,— দেখ বিদেশী পথিক! আমি নিবিড় কালো, লোকে তাই আমাকে কাজরিয়া ব'লে উপহাস ক'রে। তাদের সে আঘাত আমি সহিতে — উপেক্ষা ক'রতে পারি, আমার সে সহ্যশক্তি আছে; কিন্তু ওগো নিষ্ঠুর! তুমিই কেন আমায় ভালবাসি ব'লে উপহাস ক'রছ? ওগো সুন্দর শ্যামল! তুমি কেন এ হতভাগিনীকে আঘাত ক'রছ? এ অপমানের দুর্বীর লজ্জা রাখি কোথায়? জানি, আমি কালো কুৎসিত, তাই ব'লে ওগো পরদেশী, তোমার কি অধিকার আছে আমাকে এমন ক'রে মিথ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ ক'রবার? ছি-ছি, আমায় ভালবাসতে নেই— ভালবাসা যায় না, ভালবাসতে পারবে না! এমন ক'রে আর আমার দুর্বলতায় বেদনা-ঘা দিও না শ্যামল, দিও না। ও তো আমার অপমান নয়, ও যে আমার ভালবাসার অপমান! তা কেউ সহিতে পারে না। বিদায় শ্যামল, বিদায়!

আমি মনে মনে ব'ললাম,— ওগো অভিমানিনি! অভিমানের গাঢ় বিক্ষোভ তোমায় অন্ধ করেছে, তাই তুমি সকল কথা বুঝেও বুঝছ না। আমিও যে তোমার মতই কালো। তুমি তো নিজ মুখেই আমায় শ্যামল ব'লেছ, অথচ সুন্দর

ব'লছ কেন? তোমার চোখে তুমি আমায় যেমন সুন্দর দেখেছ, আমার চোখে আমিও তেমনি তোমার সৌন্দর্য দেখেছি। তোমার ঐ কালো রূপেই আমার চির-আকাঙ্ক্ষিতাকে খুঁজে পেয়েছি, যেন সে কোন্ অনাদি যুগের অনন্ত অব্ধেষণের পর। আর যদি অধিকারই না থাকে, তবে তুমি কারুর আঘাতে বেদনা পেলে না, অথচ আমার স্নেহ সহিতে পারলে না কেন? আমারই উপরে বা তোমার কি দাবী পেয়েছ, যার জোরে সবারই আঘাত বেদনাকে উপেক্ষা ক'রতে পার, শুধু আমাকেই পার না? আমার বক্ষ দলিত ক'রে কি ক'রে আমায় এমন ছেড়ে যেতে পারছ? যার ভালবাসায় বিশ্বাস নেই, তার ওপর তো অভিমান করা চলে না। যাকে বুঝি, আর আমার দাবী আছে যে, আমার অভিমান এ সহ্য ক'রবে, তারই ওপর অভিমান আসে, তারই ওপর রাগ করা যায়। আমার যে তখন মস্ত বিশ্বাস থাকে, সে আমার এ অহেতুক অভিমানের আঙ্গার এ সহ্য ক'রবেই, কেননা সে যে আমায় ভালবাসে!...

সে কোন কথা বুঝল না, চ'লে গেল। এ তীব্র অভিমান যে তার কার ওপর, সে নিজেই ব'লতে পারত না, তবে কতকটা যেন তার এই কালো রূপের স্রষ্টার ওপর। আর বুক-ভরা অভিমান আহত পক্ষী-শাবকের মত যেন সেই দুর্বোধ রূপ-স্রষ্টার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ব'লছিল, — ওগো, আমাকেই কি সারা দুনিয়ার মাঝে এমন ক'রে কালো কুৎসিত ক'রে সৃষ্টি ক'রতে হয়? তোমার কুণ্ড-ভরা রূপের একটি রেণু এ অভাগীকে দিলে কি তোমার ভরা কুণ্ড খালি হ'য়ে যেত? যদি কালো ক'রেই সৃষ্টি ক'রলে, তবে ঐ অন্ধকারের মাঝে আলোর মত ভালবাসা দিলে কেন? আবার অন্যেরে দিয়ে ভালবাসিয়ে লজ্জিত কর কেন?... হায়, সে যে কখনও বোঝেনি যে, সত্য সৌন্দর্য বাইরে নয়, ভিতরে — দেহে নয়, অন্তরে!

আমি সে দিন এই একটা নতুন জিনিস দেখেছিলাম যে, যতদিন সে কারুর ভালবাসা পায়নি, ততদিন তার সারা জনমের চাপা অভিমান এমন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে নি, কিন্তু যেই সে বুঝলে কেউ তাকে ভালবেসেছে অমনি তার কান্না-ভরা অভিমান ঐ স্নেহের আহ্বানে দুর্জয় বেগে হাহাকার ক'রে গর্জন ক'রে উঠল! এই ফেনিয়ে ওঠা অভিমানের জন্যেই সে যাকে ভালবাসে, তাকে এড়িয়ে গেল। এমন ভালবাসায় যে প্রিয়তমাকে এড়িয়ে চলাতেই আনন্দ! এ বেদনা-আনন্দের মাধুরী আমার মত আর কেউ বোঝে নি।

হায়, আমার মনের এত কথা বুঝি মনেই ম'রে গেল! এ জীবনে আর তা বলা হবে না।

তার পর-বছরের কথা।

কাজুরিয়ার সঙ্গে আবার আমার দেখা হ'ল মির্জাপুরের পাহাড়ের বৃকে বিরহী নামক উপত্যকায়। সে-দিন ছিল ভাদ্রের কৃষ্ণ-তৃতীয়া। সে-দিনও মেঘে আঁধারে কোলাকুলি ক'রছিল! সে-দিন ছিল কাজুরী উৎসবের শেষ দিন! সে দিন বাদল-মেঘ ধানের ক্ষেতে তার শেষ বিদায়-বাণী শোনাচ্ছিল, আর নবীন ধানও তার



মঞ্জুরী দুলিয়ে কেঁপে কেঁপে বাদলকে তার শেষ অভিনন্দন জানাচ্ছিল। হায়, এদের কেউ জানে না, আবার কোন্ মাঠে কোন্ তালী-বনের রেখা-পারে তাদের নতুন ক'রে দেখা-শোনা হবে। আজ সুন্দরীদের চোখের কাজল মলিন, তাদের সুরে কেমন একটা ব্যথিত ক্লাস্তি, সুন্দর ছোট মুখগুলি রোদের তাপে শালের কচি পাতার মত ম্লান—এলানো! কাল যে এই সারা বছরের চাওয়া বাদল-উৎসবের বিসর্জন, এইটাই তাদের এত আনন্দকে বারে-বারে ব্যথা দিয়ে যাচ্ছিল। কে জানে, তাদের এই সখীদের এমনি ক'রে পর-বছর আবার দেখা হবে কি না! হয় তো এরই মাঝের কত চেনা মুখ কোথায় মিশিয়ে যাবে, সারা দুনিয়া খুঁজেও সে-মুখ আর দেখতে পাবে না।

দোলনার সোনালি রঙ-এর ডোরকে উজ্জ্বলতর ক'রে বারে বারে ছুরি-হানার মত বিজুরী চমকে যাচ্ছিল! কাজুরী ছুটে এসে আমার ডান হাতটি তার দু'হাতের কোমল মুঠির মধ্যে নিয়ে বুকের উপর রাখলে, তার পর ব'ললে, —ওগো পরদেশী শ্যামল, তোমায় আমি চিনেছি! তুমি সত্য। তুমি আমায় ভালবাস! নিশ্চয় ভালবাস! সত্যি ভালবাস!

দেখলাম, তার শীর্ণ চোখের উজ্জ্বল চাউনিতে গভীর ভালবাসার ছল-ছল জ্যোতি শরৎ-প্রভাতের জল-মাখা রোদুরের মত করুণ হাসি হেসেছে! আহ, এত দিনের বিরহের কঠোর তপস্যায় সে তার সত্যকে চিনতে পেরেছে! তার ছিন্ন মলিন তনুলতার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার চোখের জল সামলানো দায় হ'য়ে উঠলো! এক বিন্দু অসম্বরণীয় অবাধ্য অশ্রু তার পাদুর কপোলে ঝ'রে পড়তেই সে আমার পানে আর্ত দৃষ্টি হেনে ঐখানেই ব'সে প'ড়ল! বকুল-শাখা আর শিউলি পাতা তার মাথায় ফুল-পাতা ফেলে সান্ত্বনা দিতে লাগল!

মতিয়া ব'ললে, এবারও সে অনেক আশা ক'রে আগের বছরের মতই শাবণ-পঞ্চমীর ভোরে কাজুরী গেয়ে যমুনা-সিনানে গিয়ে সেখানকার মাটি দিয়ে ধানের অঙ্কুর উদগম ক'রেছিল। সেই অঙ্কুরগুলি সে নিবিড় যতনে তাঁর ছিন্ন ভেজা ওড়না দিয়ে আজও ঢেকে রেখেছে। সে রোজই বলত —“মতিয়া রে, এবার আমার পরদেশী ব'ন্ধু আসবে। ঐ যে গুনতে পাচ্ছি তার পথিক গান।”

আজ ভাদ্র-তৃতীয়াতে নবীন ধানের মঞ্জুরী নিয়ে কতকগুলি সে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে, আর কয়েকটি শিশ এনেছে আমাকে উপহার দিতে! আমি তার হাতে নাড়া দিয়ে ব'ললাম, —“কাজুরী, আজ আমায় ছেড়ে যেও না।”

শুষ্ক অধর-কোণে তার আধ টুকরো ম্লান হাসি ফুটতে ফুটতে মিলিয়ে গেল। সে অতিকষ্টে তার আঁচল থেকে বহু যত্নে রক্ষিত ধানের সবুজ শিশ ক'টি বের ক'রে একবার তার দু'টি জল-ভরা চোখের পূর্ণ চাওয়া দিয়ে আমার পানে চেয়ে দেখলে, তার পর আমার স্বন্ধদেশে ক্লাস্ত বাহু দু'টি খুয়ে আমার কর্ণে শীষগুলি পরিয়ে দিলে। একটা গভীর তৃপ্তির দিঘল শ্বাসের সঙ্গে পবিত্র একরাশ হাসি তার চোখে-মুখে হেসে উঠল! দেখে বোধ হ'ল, এমন প্রাণ ভরা সার্থক হাসি সে যেন আর জন্মে হাসে নি!

আবার একটু পরেই কি মনে হ'য়ে তার সারা মুখ ব্যথায় পান্ডুর হ'য়ে উঠল। সহসা চিৎকার ক'রে সে ক'য়ে উঠল,—না শ্যামল, না —আমাকে যেতেই হবে। তোমার এই বুক-ডরা ভালবাসার পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে আমায় বিদায় নিতে দাও!

কোলের উপর তার শান্ত মাথা লুটিয়ে প'ড়ল। চির-জনমের কামনার ধনকে আমার বুকের ওপরে টেনে নিলাম। আকুল ঝঙ্কা উন্মাদ বৃষ্টিকে ডেকে এনে আমায় ঘিরে আত্ননাদ ক'রে উঠল,—ওহু! —ওহু! —ওহু!

আমার মনে হয়, চাওয়ার অনেক বেশি পাওয়ার গর্বই তাকে বাঁচতে দিলে না! সে মরণ বরণ ক'রে তার কালো রূপস্রষ্টার কাছে চ'লে গেল! এবার বুঝি সে অনন্ত রূপের ডালি নিয়ে আর এক পথে আমার অপেক্ষায় ব'সে থাকবে!... কালো মানুষ বড্ডো বেশি চাপা অভিমানী। তাদের কালো রূপের জন্যে তারা মনে ক'রে, তাদের কেউ ভালবাসতে পারে না। কেউ ভালবাসছে দেখলেও তাই সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। বেচারাদের জীবনের এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

\*

\*

\*

বাদল-ভেজা তারই স্মৃতি

এ-বছরও তেমনি শাউন এসেছে। আজও আমার সেই প্রথম-দিনে-শোনা কাজরী গানটি মনে প'ড়ছে,—ওগো শ্যামল, তোমার ঘোমটা খোল!

হায় রে পরদেশী সাবলিয়া! তোমার এ অবগুষ্ঠন আর জীবনে খুলল না, খুলবে না!...

আজ যখন আমার ক্লান্ত আঁখির সামনে আকাশ-ভাঙা ঢেউ ভেঙে ভেঙে প'ড়ছে, পূরবী-বায় হু-হু ক'রে সারা বিশ্বের বিরহ কান্না কেঁদে কেঁদে যাচ্ছে, নীরেট আঁধার ছিঁড়ে ঝড়ের মুখে উগ্র মল্লারের তীব্র গোঙানি ব্যথিয়ে উঠছে,—ওগো, সামনে আমার পথ নেই—পথ নেই! অনন্ত বৃষ্টির আকুল ধারা বইছে! —এমন সময় কোথায় ছিলে ওগো প্রিয়তম আমার! এ বছরের মেঘ-বাদলে এমন ক'রে আমায় যে দেখা দিয়ে গেলে, আমার প্রাণে যে কথা ক'য়ে গেলে! হারানো প্রেয়সী আমার! তোমার কানে-কানে বলা গোপন গুঞ্জন আমি এই বাদলে শুনেছি, শুনেছি।

এই তোমার টাটকা-ভাঙা রসাক্ষরের মত উজ্জ্বল নীল গাঢ় ক্লান্তি! ওগো, এই তোমার কাজল-কালো স্নিগ্ধ সজল রূপ আমার চোখে অঞ্জন বুলিয়ে গেল! ওগো আমার বারে-বারে হারানো মেঘের দেশের চপল প্রিয়! এবার তোমায় অশ্রুর ডোরে বেঁধেছি! এবার তুমি যাবে কোথা? লোহার শিকল বারে-বারে কেটেছে তুমি মুক্ত-বনের-দুষ্ট-পাখি, তাই এবার তোমায় অশ্রুর বাঁধনে বেঁধেছি, তাকে ছেদন করা যায় না। ঐ ঘন নীল মেঘের বুক, এই সবুজ কচি দুর্বা,



ভেজা ধানের গাছের রসে তোমায় পেয়েছি। ওগো শ্যামলী! তোমার এ শ্যাম  
শোভা লুকাবে কোথায়? ঐ সুনীল আকাশ, এই সবুজ মাঠ, পথহারা দিগন্ত, —  
এতেই যে তোমার বিলি দেওয়া চিরন্তন শ্যামরূপ লুটিয়ে প'ড়ছে। তাই আজ  
এই শ্রাবণ-প্রাতে ধানের মাঝে বসে গাইছি, —

“আমার নয়ন-ভুলানো এলে!

আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে!

শিউলিতলার পাশে পাশে,

ঝরা ফুলের রাশে রাশে,

শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে

অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে

নয়ন-ভুলানো এলে।”

যখন চোখ মেলে চাইলাম, তখন বৃষ্টির ধারা বাঁধ-ছাড়া অযুত পাগলা-ঝরার  
মত ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ছে-ঝম্ ঝম্ ঝম্! এত জলও ছিল আজিকার মেঘে!  
আকাশ-সাগর যেন উলটে পড়েছে, এ বাদল-বরিষণের আর বিরাম নেই, বিরাম  
নেই!...

বৃষ্টিতে কাঁপতে কাঁপতে দেখলাম, আঁখির আগে আমার নীলোৎপল-প্রভ  
মানস-সরোবরে ফুটে রয়েছে সরোবর-ভরা নীল-পদ্ম!

All kinds of pdf Download

[MyMahbub.Com](http://MyMahbub.Com)